ইসলামী গণতন্ত্রের অসংলগ্নতা : পদ্ধতি ও গন্তব্য

আসিফ আদনান

কিছুদিন আগের একটা লেখায় গণতান্ত্রিক ইসলামী দলগুলোর আদর্শ এবং পদ্ধতিগত দুটো অস্পষ্টতার কথা বলেছিলাম। প্রথম অস্পষ্টতা গণতন্ত্রের সংজ্ঞায়ন নিয়ে। দ্বিতীয় অস্পষ্টতা, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তারা ঠিক কীভাবে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চান, সেই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে। সংজ্ঞায়নের সমস্যা নিয়ে কিছু কথা সেই লেখায় বলেছিলাম। আজ অন্য অস্পষ্টতার দিকে তাকানো যাক।

প্রথম প্রশ্ন পদ্ধতি নিয়ে। সংসদীয় গণতন্ত্র থেকে ইসলামী শাসনে যাওয়া, পসিটিভ ল' এর বদলে শরীআহতে ফিরে যাওয়া, শুধু সরকার পরিবর্তনের বিষয় না। বরং এটা শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের বিষয়। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত কোন দল কীভাবে এই পরিবর্তন করবে? কতোটুকু ভোট পেলে এধরণের আমূল পরিবর্তন করা সম্ভব?

ধরুন কোন গণতান্ত্রিক ইসলামী দল ৬০% ভোট পেয়ে এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল। এ অবস্থায় তারা কি এই পরিবর্তন আনতে পারবে? যদি নির্বাচিত সরকার এমন করতে চায় তাহলে কি রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্য অংশ তাদের সমর্থন দেবে? প্রশাসন, জুডিশিয়ারি, বিভিন্ন বাহিনী যদি বেঁকে বসে, বাঁধা দেয় – তাহলে কী হবে?

গণতান্ত্রিক ইসলামপন্থীদের ক্ষমতায় যাবার পরের কর্মকান্ডের যেসব উদাহরণ মিসর, তিউনিশিয়া ইত্যাদি জায়গাতে আছে, সেগুলো তেমন সুখকর না। এই পরিবর্তন কীভাবে হবে এ ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট উত্তর গণতান্ত্রিক ইসলামী দলগুলোর কাছে পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্য হয় অনুপস্থিত, অথবা অস্পষ্ট।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, ফিসিবিলিটি নিয়ে। এই দলগুলোর আসলে এককভাবে ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা কতোটুকু? গণতান্ত্রিক ইসলামী দলগুলোর নির্বাচনে পারফরম্যান্স কেমন? আমি অল্প কিছুটা খোঁজার চেষ্টা করলাম -

- পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৯১) - ১৯ আসন (জামাআতে ইসলামী ১৮, ইসলামী ঐক্যজোট ১),
- সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৯৬) - ৪ আসন (জামাআতে ইসলামী ৩, ইসলামী ঐক্যজোট ১),
- অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (২০০১) – ১৯ আসন (জামাআতে ইসলামী ১৭, ইসলামী ঐক্যজোট ২। একটা প্রতিবেদনে দেখলাম ০১-এ ইসলামী ঐক্যজোট ৪টি আসন পেয়েছে। এই মূহুর্তে যাচাই করতে পারছি না।)
- নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (২০০৮) – ২ আসন (জামাআতে ইসলামী ২)

উল্লেখ্য, ইসলামী ঐক্যজোট প্রাথমিকভাবে ছয়টি কওমি মাদ্রাসাকেন্দ্রিক ইসলামী দল নিয়ে গঠন হয়। দলগুলো হল - খেলাফত মজলিস, খেলাফত আন্দোলন, নেজামে ইসলামী পার্টি, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন (বর্তমান ইসলামী আন্দোলন), জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও ফরায়েজী আন্দোলন। বর্তমানে ঐক্যজোট বেশ অনেকগুলোভাগে বিভক্ত। ভাগগুলোর হিসেব রাখা মুশকিল।

এই তথ্যগুলো কেবল একনজরে মূল ছবিটা দেখার জন্য। মূল প্রশ্ন হল, এই হারে, আনুমানিক কতো বছর এই দলগুলো এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবার আশা করে? রিয়ালিস্টিকালি? ৯১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত ১৭ বছরে তেমন কোন অগ্রগতি দেখা যায় না। ২০০৮ থেকে গতো ১২ বছরের অবস্থা কেমন ছিল তা সবার সামনেই আছে। তাই ৯০ থেকে ২০২০ পর্যন্ত সময়ের ট্রেন্ডের দিকে তাকালে আগামী ৩০ কিংবা ৫০ বছরে কি বড় কোন অগ্রগতি আসা করা যায়? বিশেষ করে এই দলগুলোর কাজের পদ্ধতি, অ্যাপ্রোচ, মেসেজিং এ যেহেতু তেমন কোন মৌলিক পরিবর্তন আসেনি?

দলগুলোর মধ্যে নির্বাচনে সবচেয়ে সফল জামাআতে ইসলামী। দলটি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ইসলামী দলগুলোর মধ্যে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে সুসংগঠিতও। তাদেরও সর্বোচ্চ আসনসংখ্যা ১৮। যদি জামাআতে ইসলামীর এ অবস্থা হয় তাহলে অসংখ্য ভাগে বিভক্ত কওমি রাজনৈতিক দলগুলোর সম্ভাবনা কেমন?

দুই সেক্যুলার জোটের কোন একটার অংশীদার হয়ে সরকারের যাওয়া ছাড়া নির্বাচনী রাজনীতিতে অন্য কোন বড় অর্জনের বাস্তবসম্মত সম্ভাবনা অন্তত আগামী ৩০ বছরের জন্য এ দলগুলোর সামনে দেখা যাচ্ছে না। এসব জোটের অংশ হয়ে নিশ্চিতভাবেই তারা ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। জোটে থেকে কী কী অর্জন হতে পারে তার বেশ কিছু উদাহরণ আমাদের সামনে আছে। চার-দলীয় জোটে ইসলামী ঐক্যজোটের সদস্য দলগুলো ছিল। মহাজোটে নাকি ৭০টার কাছাকাছি ইসলামী দল আছে। এসব জোটে অংশ নিয়ে কিছু টোকেন বিষয় ছাড়া আর তেমন কোন অর্জন হয়নি। এই অর্জনগুলোকে কোন অর্থেই ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রগতি বলা যায় না। এই দলগুলো বড়জোর সেক্যুলার জোটের জুনিয়র পার্টনার হিসেবে ক্ষমতায় গিয়ে অল্প কিছু বিষয়ে সরকারী পলিসিকে সামান্য প্রভাবিত করতে পারে। খুব বেশি হলে দু-একটা মন্ত্রনালয় হয়তো কয়েক বছরের জন্য পেতে পারে।

‘এটুকু অর্জন কি কম?’, প্রশ্ন আসতে পারে।

কিন্তু প্রশ্নটা হওয়া উচিৎ, এটুকু অর্জন কমবেশি যাই হোক – এটাকে কি ইসলাম কায়েমের পথ ও পদ্ধতি বলা যায়?

জামাআতে ইসলামী থেকে শুরু করে ঐক্যজোট – সবাই দাবি করেন তারা বিকল্প না পেয়ে এই পন্থায় ইসলাম কায়েমের চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমরা দেখছি সেক্যুলার জোটের জুনিয়র পার্টনার হওয়াটাই গণতান্ত্রিক ইসলামী দলগুলোর জন্য সবচেয়ে বাস্তবসম্মত লক্ষ্য। এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এর বেশি কিছু অর্জনের সম্ভাবনা নেই। মনে রাখবেন, যদি ৩০ কিংবা ৫০ বছর পর এ দলগুলো এককভাবে ক্ষমতায় যেতেও পারে, তবুও কিভাবে সংসদীয় গণতন্ত্র আর পসিটিভ ল’-কে বিলুপ্ত করে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে, সেটা নিয়েও কোন স্পষ্ট উত্তর তাদের কাছে নেই। অর্থাৎ ক্ষমতায় গিয়ে কীভাবে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা হবে, তা নিয়েও স্পষ্ট বক্তব্য নেই। আবার এককভাবে ক্ষমতায় যাওয়ার কোনও বাস্তবসম্মত সম্ভাবনাও দেখা যায় না। তাই এধরণের গণতান্ত্রিক ইসলামী দলগুলো বেশি হলে, এক ধরণের মাইনরিটি প্রেশার গ্রুপ বা লবির ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু এটাকে ইসলাম কায়েমের পদ্ধতি কেন বলা হচ্ছে?

এ দলগুলো সরাসরি যদি বলতো –আমরা এই সিস্টেমে অংশগ্রহণ করে কিছু নির্দিষ্ট স্বার্থসংরক্ষণের চেষ্টা করছি, কিছু বাতিলের পথ বন্ধ করতে চাচ্ছি। সেক্যুলার দলগুলোকে কিছুটা প্রেশারাইয করছি - তাহলে তাদের দলের নেতাকর্মীদের কোন ভুল ধারণা থাকতো না। তারা বুঝতো আসলে তারা কীসের জন্য কাজ করছেন। কীসের জন্য কুরবানী করছেন। এই স্বচ্ছতা থাকলে এই দলগুলোর কাজকে সম্মান করাও হয়তো কিছুটা সহজ হতো।

কিন্তু তারা এটা বলছেন না। তারা জোরালোভাবে বলছেন যে এটা ইসলাম কায়েমের পথ। তারা এই পদ্ধতিতে ইসলাম কায়েমের জন্য কাজ করছেন। অথচ এই দাবিগুলোর কোন বাস্তবতা নেই। এই ভুল দাবির কারণে বিশাল একটা অংশ মূল সমস্যার সমাধান নিয়ে কিছু করছে না, সমাধান নিয়ে চিন্তাও করছে না। তারা ধরে নিয়েছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তারা সাওয়াবের কাজ করছেন! অনেকে তো হাস্যকরভাবে একে ‘জি হা দ’-ও বলছেন!

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও শাসন, মৌলিকভাবে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। জনগনের ভোটে সংসদ সদস্যদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়া এবং মানবরচিত আইন দিয়ে শাস্ন মৌলিকভাবে তাওহিদ ও ইমানের সীমালঙ্ঘন করে। এর ফলে আল্লাহর আইন ব্যাতীত অন্য আইন দিয়ে শাসন, আল্লাহর আইনকে বাতিল করে অন্য আইন প্রণয়ন, হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম করা এবং মানুষকে তাগুতের কাছে বিচার-ফায়সালা চাইতে বাধ্য করার মতো বিভিন্ন কুফর ও শিরক আকবর সংঘটিত হয়। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মতো ঐচ্ছিক বিষয়ের ক্ষেত্রে বাধ্যতা, অপারগতার অজুহাত দেয়া যায় না, যেহেতু বিষয়গুলো শিরক ও কুফরের। একই সাথে কল্পিত ‘বৃহত্তর কল্যাণ’-এর যুক্তিও এখানে খাটে না, যেহেতু আদতে এসব করে কী ‘কল্যাণ’ এসেছে তিন দশক ধরে তা

মানুষ দেখছেন। তবে, এই গুরুতর আকীদাগত বিষয়গুলোকে তর্কের খাতিরে সাময়িকভাবে একপাশে রেখে আলোচনা করা হলেও, গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রবর্তকদের কথা, কাজ, পদ্ধতি এবং বাস্তবতার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। গণতান্ত্রিক ইসলামী দলগুলোর পথ, পদ্ধতি ও আদর্শ নিয়ে অস্পষ্টতার কোন সুরাহাও হয় না।